জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

৭৪তম অধিবেশন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

জাতিসংঘ সদর দপ্তর।

নিউ ইয়র্ক

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

১২ আশ্বিন ১৪২৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাই। একইসঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিজ্ মারিয়া ফার্নান্দা এসপিনোসা গার্সেসকে বিগত এক বছর ধরে সাধারণ পরিষদে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব আন্তোনিও গুতেরেসকে তাঁর গতিশীল নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

আমি এই মহান মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্মরণ করছি বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি ১৯৭৪ সালে এই পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: আমি উদ্ধৃত করছি: "এই দুঃখ দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। নানা অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জাতিসংঘ তার প্রতিষ্ঠার পর সিকি শতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবজাতির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে"। উদ্ধৃতি শেষ। বস্তুতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়ন, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের নেতৃত্বমূলক ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশে আমরা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে তা শুরু হতে যাচ্ছে। তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়ে আগামী বছর জাতিসংঘে আমরা এ উৎসব উদযাপন করতে চাই।

জনাব সভাপতি,

এবারের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং অন্তর্ভুক্তির জন্য মাল্টিলেটারিজম বা বহুপাক্ষিকতাকে উজ্জীবিত করার যে আহ্বান আপনি করেছেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশ্বের বহুপাক্ষিক ফোরামের কর্ণধার হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদই এই আহ্বানকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তাকে এগিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য রাখে। এই অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং অন্তর্ভুক্তির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে আমাদের যে অঙ্গীকার ও যৌথ আকাঙ্ক্ষা তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে যা আমাদের জনগণের আস্থা অর্জনে সাহায্য করেছে এবং আমরা টানা তৃতীয়বারের মত সরকার গঠন করেছি। আমাদের ২১ দফার রাজনৈতিক অঙ্গীকার মূলত জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত গৃহীত অঙ্গীকার।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ আজ প্রায়শই 'উন্নয়নের বিস্ময়' হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে নানা অস্থিরতা এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত আর্থিক মন্দা স্বত্বেও বাংলাদেশ গত ১০ বছর ধরে সমৃদ্ধি বজায় রেখেছে। স্পেকটেটর ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী, গত ১০ বছরে মোট ২৬টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ। এ সময়ে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনের ব্যাপ্তি ঘটেছে ১৮৮ শতাংশ। ২০০৯ সালে আমাদের জিডিপি'র আকার ছিল ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বেড়ে চলতি বছরে দাঁড়িয়েছে ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া উন্নয়ন কৌশল হিসেবে আমরা মনোনিবেশ করেছি দারিদ্র্য দূরীকরণ, টেকসই প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়নের মত বিষয়সমূহকে। গত ১০ বছর ধরে আমরা প্রগতিশীল ও সময়পোযোগী নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছি যা আমাদের এনে দিয়েছে অসামান্য সাফল্য। আমাদের রপ্তানি আয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় তিন গুণ বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হয়েছে ৪০.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাথাপিছু আয় সাড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৯ মার্কিন ডলার হয়েছে। গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৩ শতাংশ।

২০০৫-০৬ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে আমাদের বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৬ শতাংশ হতে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ৫ গুণ বেড়ে হয়েছে ৭০ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৯ গুণ বেড়ে হয়েছে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জনাব সভাপতি,

উন্নয়নের দুটি প্রধান অন্তরায় হলো দারিদ্র্য ও অসমতা। দ্রুততম সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। ২০০৬ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ যা ২০১৮ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২১ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশ হতে ১১ দশমিক ৩ শতাংশে নেমেছে। 'আমার গ্রাম আমার শহর', 'আশ্রায়ণ', 'আমার বাড়ি আমার খামার'-এর মত আমাদের নিজস্ব এবং গ্রামবান্ধব উদ্যোগসমূহ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে পেছনে ফেলে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম।

জনাব সভাপতি,

সামাজিক নিরাপত্তা, শোভন কর্ম পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণ বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন কৌশল। বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে সমাজের অনগ্রসর ও অরক্ষিত অংশের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। অর্থ, খাদ্য, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও সমবায়-এর মাধ্যমে এই সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের জিডিপি'র ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হচ্ছে।

নারী-পুরুষ সমতা এবং বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তির মাইলফলক অর্জনের পর আমরা এখন মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে মনোনিবেশ করেছি। এ লক্ষ্যে ই-শিক্ষা এবং যোগ্য শিক্ষক তৈরির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছি। ফলে বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ার হার ৫০ শতাংশ হতে ১৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে আমরা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচি শুরু করি। এ পর্যন্ত প্রায় ২৯৬ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। শুধু ২০১৯ সালেই ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২টি বই বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উপ-বৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ মায়ের কাছে উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে।

জনাব সভাপতি,

সকল নাগরিককে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রায় ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক আমরা গড়ে তুলেছি। এসব কেন্দ্র হতে গ্রামীণ জনগণকে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ এবং স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়। সেবাগ্রহীতাদের ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। এসব কর্মসূচির ফলে মাতৃমৃত্যুর হার, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার, পুষ্টিহীনতা, খর্বকায়তা ও ওজনহীনতার মত সমস্যাসমূহ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী, অটিজম এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত করার বিষয়টিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। বর্তমানে এ ধরনের প্রায় ১৬ লাখ ৪৫ হাজার ব্যক্তি নিয়মিত সরকারি ভাতা পাচ্ছেন।

জনাব সভাপতি,

প্রযুক্তিতে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য আমরা মানবসম্পদে ব্যাপক বিনিয়োগ করছি। সারাদেশে ৫ হাজার ৮০০ ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ৬০০ সরকারি ই-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটি এবং টেলি-ঘনত্ব ৯৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। চলতি বছর আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি যা প্রত্যন্ত এলাকায় সম্প্রচার সেবা সম্প্রসারণ সহজতর করেছে এবং উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে।

সুনীল অর্থনীতি তথা ব্লু-ইকোনমি হলো আমাদের সম্ভাবনার আরেকটি নতুন দ্বার। বঙ্গোপসাগর হতে সম্পদ আহরণে আমরা একটি নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছি। জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সীমানার অভ্যন্তরে ও বাইরে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র রক্ষার্থে আমরা অবদান রেখে চলেছি।

জনাব সভাপতি,

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মূলনীতিকে উপজীব্য করে আমরা রূপপুরে আমাদের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে ৯৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রতি অঙ্গীকার মূলত পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানেরই বলিষ্ঠ প্রতিফলন। সম্প্রতি আমরা 'পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি' অনুস্বাক্ষর করেছি।

জনাব সভাপতি,

সদ্য সমাপ্ত 'Climate Action Summit' এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যে কার্যক্রম গ্রহণের ঘোষণা এসেছে তা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অংশ হিসেবে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নকে আরও বেগবান করবে। 'Climate Resilience and Adaptation' সংক্রান্ত জোটের অংশীদার হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানা বাধা-বিপত্তি ও দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় আমরা রূপান্তরযোগ্য এবং জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি ও শস্য উদ্ভাবন করেছি। এ বিষয়ে আমরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি।

অভিযোজন ও সহনশীলতার জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি অর্থ-প্রযুক্তিগত, সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এতে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'Global Commission on Adaptation' এর সভার ঘোষণা অনুযায়ী আমরা ঢাকায় একটি 'Global Centre for Adaptation' স্থাপনের জন্য কাজ করছি।

জনাব সভাপতি,

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী মোতায়েনে জাতিসংঘের আহ্বানে নিয়মিতভাবে সাড়া প্রদান করে আসছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী করে তুলতে জাতিসংঘ মহাসচিবের গৃহীত উদ্যোগের প্রতি আমরা সমর্থন ব্যক্ত করছি।

তাঁর Action for Peacekeeping উদ্যোগ বাস্তবায়নের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা অন্যতম চ্যাম্পিয়ন দেশ হিসেবে ঐ উদ্যোগে সামিল হয়েছি। এছাড়া, 'টেকসই শান্তি'-এর ধারণাগত কাঠামো প্রণয়নে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছি।

আমরা 'শান্তির সংস্কৃতি' (Culture of Peace) ধারণাকে নিয়মিতভাবে উত্থাপন করে আসছি। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে এটি জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়েছে। এ মাসের শুরুতে এই সভাকক্ষেই আমরা Culture of Peace ঘোষণার ২০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছি। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। ফলে মানুষের মনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ নিরাপদ, সুষ্ঠু ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। 'Global Compact on Migration' সফলভাবে গৃহীত হওয়ার পর, বাংলাদেশ এই কম্প্যাক্ট বাস্তবায়নের কার্যবিধি প্রণয়ন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে আমরা অভিবাসনের বিভিন্ন ইস্যুকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছি।

অনিয়মিত অভিবাসন ও মানবপাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা। যার মূলে রয়েছে জটিল ও সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র। জাতীয় পর্যায়ে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানবপাচার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি আমরা মানবপাচার বিষয়ক 'পালেরমো প্রোটোকল'-এ যোগদান করেছি।

জনাব সভাপতি,

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের পরিচালিত গণহত্যায় ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষ নিহত এবং দুই লাখ নারী নির্যাতনের শিকার হন।

আমাদের এই নির্মম অভিজ্ঞতাই সব সময় আমাদের নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে সাহস যুগিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ফিলিস্তিনী ভাই-বোনদের ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ সংগ্রাম সফল না হচ্ছে, ততদিন তাঁদের পক্ষে আমাদের দৃঢ় অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

জনাব সভাপতি,

এটি বাস্তবিকপক্ষেই দুঃখজনক যে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান না হওয়ায় আজ এই মহান সভায় এ বিষয়টি আমাকে পুনরায় উত্থাপন করতে হচ্ছে। ১১ লাখ রোহিঙ্গা আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে। হত্যা-নির্যাতনের মুখে তারা মিয়ানমার হতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। যদিও রোহিঙ্গা সমস্যা প্রলম্বিত হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে, কিন্তু মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও চলাফেরার স্বাধীনতা এবং সামগ্রিকভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে ফিরে যায়নি।

আমি অনুরোধ করব, এই সমস্যার অনিশ্চয়তার বিষয়টি যেন সকলে অনুধাবন করেন। এই সমস্যা এখন আর বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। বাংলাদেশের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়টি এখন আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, ক্রমবর্ধমান স্থান সঙ্কট এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে এই এলাকার পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে।

জনাব সভাপতি,

আমরা এমন একটি সমস্যার বোঝা বহন করে চলেছি যা মিয়নামারের তৈরি। এটি সম্পূর্ণ মিয়ানমার এবং তার নিজস্ব নাগরিক রোহিঙ্গাদের মধ্যকার একটি সমস্যা। তাদের নিজেদেরই এর সমাধান করতে হবে। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সম্মানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় রাখাইনে নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করতে মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

আমি এর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কফি আনান কমিশনের সুপারিশসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং রাখাইন প্রদেশে বেসামরিক তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় প্রতিষ্ঠাসহ পাঁচ-দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। আজ আমি কিছু প্রস্তাব আবার পেশ করছি:

১। রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন এবং আত্মীকরণে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে হবে।

২। বৈষম্যমূলক আইন ও রীতি বিলোপ করে মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থা তৈরি করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন সফরের আয়োজন করতে হবে।

৩। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৪। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

জনাব সভাপতি,

আমরা জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক বিশেষত জাতিসংঘ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কার উদ্যোগসমূহকে সাধুবাদ জানাই। আমরা আশা করছি নতুন প্রজন্মের জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম এবং নতুনরূপে সজ্জিত জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী ব্যবস্থার দ্বারা জাতিসংঘ স্বাগতিক রাষ্ট্রের জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন ও শান্তি প্রক্রিয়ায় আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে।

এই মুখ্য প্রতিষ্ঠানকে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উপযুক্ত করে তুলতে এবং এর প্রতি মানুষের আস্থাকে সুসংহত করতে জাতিসংঘ মহাসচিব যে সকল বলিষ্ঠ ও গঠনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন আমরা তাতে আমাদের সমর্থন জানাচ্ছি।

তাঁর এই সংস্কার উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থনের স্বীকৃতি হিসেবে এবং নতুন আবাসিক সমন্বকারী ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে আমরা এই উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ডে অনুদান প্রদান করছি।

জনাব সভাপতি,

আমরা মনে করি বহুপাক্ষিকতাবাদ বৈশ্বিক সমস্যা সমাধান এবং সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘই আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এই আশাই ব্যক্ত করেছিলেন।

একটি শক্তিশালী বহুপাক্ষিক ফোরাম হিসেবে জাতিসংঘের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আমরা এর সংগঠন এবং সনদে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা প্রস্তুত থাকব। আগামী বছর জাতিসংঘের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মানব সভ্যতার জন্য একটি শক্তিশালী জাতিসংঘ তৈরি করতে আমি সকলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই যেন তা আগামী শতকের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সক্ষম হয়।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...